৪৭তম লিখিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা

আন্তর্জাতিক : ২ + বিজ্ঞান : ২

মোট সময় : ২ ঘণ্টা (নমুনা উত্তরপত্র)

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

আন্তর্জাতিক : ২

[১. খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।
২. শুধু টেকনিক্যাল ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞান অংশের উত্তর লেখার প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য সময় বরাদ্দ ১ ঘন্টা]

১. যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন : **নম্বর ১৫×৩ = ৪৫**

**** নির্দেশনা :**

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ১০ - ১১ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৫ - ৬, এভারেজ নম্বর ৭ - ৮।
iii. প্রশ্নের উত্তরে মূল বিষয়টি তুলে ধরলে, নির্ভুল তথ্য, সাম্প্রতিক তথ্যের রেফারেন্স এবং মানচিত্র দিলে ভাল নম্বর পাবে।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. খাতার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন। খাতা মূল্যায়ন শেষে খাতার দ্বিতীয় বা শেষ পৃষ্ঠায় আন্তর্জাতিক অংশের জন্য আলাদাভাবে ৪/৫টি মন্তব্য লিখে দিবেন প্লিজ।

ক. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের গঠন এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য দেশগুলির ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলি ব্যাখ্যা করুন। কেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবি প্রায়শই ওঠে তা লিখুন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের গঠন : জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (United Nations Security Council - UNSC) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গঠিত জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। পরিষদটি ১৫টি দেশ নিয়ে গঠিত : ৫টি স্থায়ী সদস্য এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য।
নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও দায়িত্বসমূহ জাতিসংঘ সনদের অধ্যায় ৫ এর ২৩ নম্বর আর্টিকেলে (Article 23) সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই আর্টিকেল স্থায়ী সদস্য হিসেবে চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মনোনীত করে এবং বাকি ১০ জন অস্থায়ী সদস্যকে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচনের বিধান রাখে।
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যা পরিষদের কার্যকারিতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে:

১. সদস্যপদের স্থায়িত্ব ও নির্বাচন : স্থায়ী সদস্যরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পরাশক্তি হিসেবে সনদ দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে নিযুক্ত। তাদের সদস্যপদের জন্য কোনো নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। অস্থায়ী সদস্যরা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রতি বছর পাঁচটি করে নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়, যারা ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক আবর্তিত নীতিতে আসে। বর্তমান অস্থায়ী সদস্যরা (২০২৫ সাল): আলজেরিয়া, গায়ানা, সিয়েরা লিওন, স্লোভেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ডেনমার্ক, গ্রিস, পাকিস্তান, পানামা এবং সোমালিয়া।

২. ভেটো ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ : স্থায়ী সদস্যদের সবচেয়ে বড় ও একচেটিয়া ক্ষমতা হলো ভেটো (Veto) ক্ষমতা। এই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা যেকোনো কার্যকরী প্রস্তাব বা রেজোলিউশনকে বাতিল করে দিতে পারে, যা পরিষদকে চরম অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। অস্থায়ী সদস্যদের কোনো ভেটো ক্ষমতা নেই। তারা কেবল পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে পারে। এই ক্ষমতার অভাবে তারা কোনো স্থায়ী সদস্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বা আটকাতে পারে না।

৩. আন্তর্জাতিক প্রভাবে পার্থক্য : স্থায়ী সদস্যরা ভেটো ক্ষমতার কারণে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। তারা তাদের জাতীয় বা মিত্রদের স্বার্থরক্ষায় সহজেই পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অস্থায়ী সদস্যরা মূলত তাদের নিজ নিজ অঞ্চল বা সাধারণ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের প্রভাব ভেটো ক্ষমতাশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবির প্রধান কারণসমূহ : নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবি উত্থাপনের মূলে এর কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আধুনিক বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে এর অসামঞ্জস্যতা দায়ী।

১. ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার ও অচলাবস্থা : স্থায়ী সদস্যরা প্রায়শই নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ভেটো ব্যবহার করে। এটি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের ধারণাকে ক্ষুণ্ন করে এবং বৈশ্বিক সংকটে (যেমন গাজায় সংঘাত বা ইউক্রেন যুদ্ধ) কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে পরিষদকে পঙ্গু করে দেয়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের বিখ্যাত উক্তি "পৃথিবী পাঁচটি দেশের চেয়ে বড়" এই কাঠামোগত ত্রুটির প্রতিই ইঙ্গিত করে।

২. দুর্বল বৈশ্বিক প্রতিনিধিত্ব ও অসামঞ্জস্য : বর্তমান কাঠামো ১৯৪৫ সালের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে। বর্তমানে বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত শক্তি যেমন ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি এবং জাপান (G4 দেশসমূহ) এবং গোটা আফ্রিকা মহাদেশের কোনো স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব নেই। এই কাঠামো আধুনিক বিশ্বের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে না।

৩. গণতান্ত্রিক মূলনীতির লঙ্ঘন : জাতিসংঘের ভিত্তি 'এক দেশ, এক ভোট'—কিন্তু ভেটো ক্ষমতা এবং স্থায়ী সদস্যের ধারণা পরিষদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। সমালোচকরা মনে করেন, এই কাঠামো ৫টি দেশের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে।

৪. আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বঞ্চনা : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও, স্থায়ী সদস্যপদে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। এই অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য স্থায়ী আসন যুক্ত করার দাবি অত্যন্ত জোরালো।

৫. কফি আনান কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব : প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনান ২০০৪ সালে জাতিসংঘের সংস্কারের জন্য একটি পরামর্শদাতা দলের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেন। এই প্রস্তাবে ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি এবং জাপানকে স্থায়ী সদস্য হিসেবে এবং আফ্রিকা ও আরব লীগ থেকে আসন যুক্ত করার কথা বলা হয়, যা বৈশ্বিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

৬. কার্যকরী পদক্ষেপের সীমাবদ্ধতা : ভেটো ক্ষমতার উপস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ প্রায়শই প্রতীকী নিন্দা বা বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকে, যা কার্যকর সামরিক বা কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে।

৭. বিশ্বস্ততার সংকট ও দ্বৈত মানদণ্ড : ভেটো ক্ষমতাশীল দেশগুলোর প্রভাব এবং তাদের দ্বৈত মানদণ্ডের কারণে (যেমন, পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি - NPT-এর সদস্য নয় এমন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তদন্ত না হওয়া), বৈশ্বিক দক্ষিণে জাতিসংঘ ও এর অঙ্গসংস্থাগুলোর ওপর আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।

৮. কাঠামোগত সংস্কারের কঠিনতা : জাতিসংঘের কাঠামোতে যেকোনো ধরনের রদবদল আনতে হলে পাঁচটি ভেটোক্ষমতা সম্পন্ন স্থায়ী সদস্যের সম্মতি অপরিহার্য। স্থায়ী সদস্যরা তাদের ক্ষমতা ছাড়তে রাজি না হওয়ায় সংস্কারের প্রক্রিয়াটি বারবার আটকে যায়।

খ. ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে বৈশ্বিক উদ্যোগগুলি আলোচনা করুন।

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাশিয়া ইউক্রেনে "বিশেষ সামরিক অভিযান" শুরুর মাধ্যমে যে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরু করে, তা ইউরোপের ইতিহাসে স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় সামরিক সংঘাত। এই আগ্রাসনটি আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি বিশ্বজুড়ে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

রাশিয়ার ঘোষিত প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগদান থেকে বিরত রাখা, ইউক্রেনকে 'ডি-মিলিটারাইজেশন' ও 'ডি-নাজিফিকেশন' করা এবং ক্রিমিয়াসহ অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মস্কো মনে করে, ন্যাটোর সম্প্রসারণ তাদের নিরাপত্তা উদ্বেগের মূল কারণ। সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল। ২০১৪ সাল থেকে রাশিয়ার দখলে থাকা ক্রিমিয়া ছাড়াও, বর্তমানে ইউক্রেনের ডনবাস (দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক) অঞ্চল এবং দক্ষিণের খেরসন ও জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের বড় অংশ রাশিয়ার দখলে রয়েছে। এই অধিকৃত অঞ্চলগুলোর বর্তমান ফ্রন্ট লাইন-ই শান্তি আলোচনার সবচেয়ে বড় বাধা।

ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত কেবল স্থানীয় যুদ্ধ নয়, এর প্রভাব বিশ্বজুড়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে:খাদ্য ও জ্বালানি সংকট (Food & Energy Crisis): রাশিয়া ও ইউক্রেন বিশ্বের প্রধান খাদ্যশস্য (গম, সূর্যমুখী তেল) ও সার সরবরাহকারী হওয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মকভাবে ভেঙে যায়। এর ফলে খাদ্যপণ্যের দাম অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায়, যা দরিদ্র দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি, রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে তেল ও গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া হয়, যা বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণ ও নিরাপত্তা কাঠামোয় পরিবর্তন: এই যুদ্ধ রাশিয়া ও পশ্চিমা ব্লকের মধ্যে সম্পর্ককে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান উল্টো ফল দিয়েছে—ফিনল্যান্ড ও সুইডেন ন্যাটোতে যোগদান করেছে, যা ইউরোপের নিরাপত্তা কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। লক্ষ লক্ষ ইউক্রেনীয় নাগরিক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, যা ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় মানবিক সংকটের সৃষ্টি করেছে।

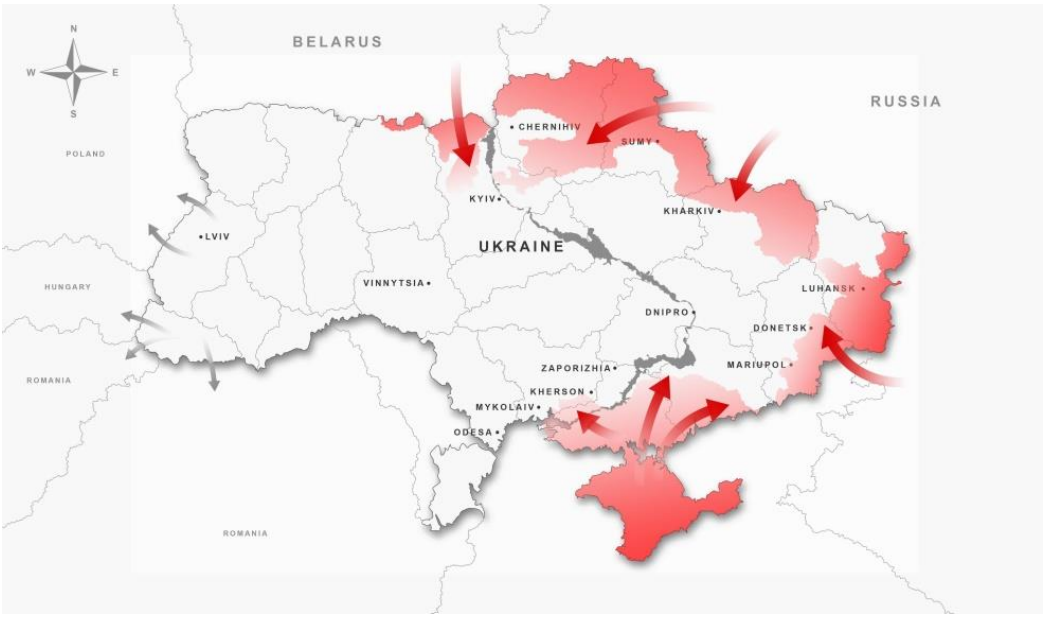

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তি কূটনৈতিক মধ্যস্থতা, চাপ প্রয়োগ এবং মানবিক সহায়তার মাধ্যমে সংঘাতের সমাধানের চেষ্টা করেছে।

১. জাতিসংঘ (UN) : জাতিসংঘ সংঘাতের সমাধানে তার কূটনৈতিক ও মানবিক ভূমিকা পালন করে চলেছে। যদিও নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) রাশিয়া তার ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে যেকোনো কার্যকরী পদক্ষেপ আটকে দিয়েছে, তবুও সাধারণ পরিষদ (UNGA) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেজোলিউশন পাস করেছে। এই রেজোলিউশনগুলোতে ইউক্রেনে রাশিয়ার 'পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের' তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভিত্তিতে 'ন্যায্য এবং টেকসই শান্তির' আহ্বান জানানো হয়েছে। সংস্থাটির মানবিক শাখাগুলো যুদ্ধপীড়িত এলাকায় খাদ্য, আশ্রয় এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে।

২. ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) : ইউরোপীয় ইউনিয়ন শুরু থেকেই ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় সমর্থক হিসেবে কাজ করেছে এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে। রাশিয়ার ব্যাংকিং, জ্বালানি, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা খাতের ওপর অভূতপূর্ব এবং কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধের একাধিক প্যাকেজ আরোপ করেছে, যার উদ্দেশ্য রাশিয়ার যুদ্ধ চালানোর সক্ষমতা হ্রাস করা। তাছাড়া EU এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইউক্রেনকে বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, যা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বজায় রাখতে অপরিহার্য ছিল। ইইউ মনে করে, কোনো চুক্তিতেই ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করা চলবে না এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য ইউক্রেনকে শক্তিশালী পশ্চিমা নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রদান করা উচিত।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের নিরাপত্তা এবং যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় সামরিক ও আর্থিক দাতা। তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মূল্যের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, গোয়েন্দা তথ্য এবং সামরিক প্রশিক্ষণ সরবরাহ করে ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে। ওয়াশিংটন রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপে পশ্চিমা জোটকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কূটনৈতিকভাবে মস্কোকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি বিতর্কিত কৌশল নিয়েছেন, যেখানে তিনি দুই পক্ষকে চাপ দিয়ে একটি চুক্তিতে আনতে চাচ্ছেন। তাঁর প্রধান প্রস্তাব হলো, যুদ্ধ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকেই তা 'কাট অ্যান্ড স্টপ' করা উচিত—অর্থাৎ, বর্তমান যুদ্ধরেখাকেই আলোচনার সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে দ্রুত যুদ্ধ বন্ধ করা।

৪. চীন (China) : চীন এই সংঘাতে 'প্রো-রাশিয়া নিউট্রালিটি' বজায় রেখেছে। তারা একদিকে রাশিয়াকে সরাসরি নিন্দা জানায়নি বা পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করেনি, অন্যদিকে নিজেদেরকে শান্তি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। চীন একটি ১২-দফা শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেছে, যার মধ্যে যুদ্ধবিরতি, সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার অবসানের মতো সাধারণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। তবে এই প্রস্তাবে রাশিয়ার ভূখণ্ডগত লাভ বা পশ্চিমাদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা না থাকায় পশ্চিমা দেশগুলো এটিকে গ্রহণ করেনি।

৫. তুরস্ক (Turkey) : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মস্কো ও কিয়েভ উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কার্যকর মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছেন। তুরস্কের মধ্যস্থতায় হয়েছিল ব্ল্যাক সি গ্রেইন ডিল, যা বৈশ্বিক খাদ্য সংকট কমাতে ইউক্রেনীয় শস্য রপ্তানি পুনরায় শুরু করতে সাহায্য করে। এরদোয়ানের প্রস্তাবে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য ইউক্রেনকে কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য ন্যাটোতে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বর্তমান ফ্রন্ট লাইন হিমায়িত (Freezing the front line) করে পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬. আরব বিশ্ব (Arab World) : উপসাগরীয় দেশগুলো, বিশেষ করে সৌদি আরব ও কাতার, নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে মানবতাকেন্দ্রিক মধ্যস্থতায় মনোযোগ দিয়েছে। সৌদি আরব জেদ্দায় ইউক্রেন বিষয়ক আন্তর্জাতিক বৈঠকের আয়োজন করেছে, যেখানে রাশিয়া বাদে প্রায় ৪০টি দেশ অংশ নেয়, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি শান্তি কাঠামোর বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপন করা। কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) রাশিয়ার হাতে আটক ইউক্রেনীয় সৈন্য ও নির্বাসিত ইউক্রেনীয় শিশুদের ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কয়েকটি সফল বন্দী বিনিময় চুক্তি সহজ করেছে।

৭. ন্যাটো (NATO) : ন্যাটো একটি সামরিক জোট হিসেবে সংঘাতের মূল কারণ হলেও, এর ভূমিকা মধ্যস্থতার চেয়ে সামরিক সমর্থনের দিকে বেশি। ন্যাটো সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিলেও, জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইউক্রেনকে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ সরবরাহ করে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জোট তার 'খোলা দরজার' নীতি বজায় রেখেছে এবং ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ সদস্যপদ নিয়ে আলোচনা করছে।

সমস্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সত্ত্বেও, চূড়ান্ত শান্তি আলোচনায় প্রধান বাধা সৃষ্টি করেছে দুই পক্ষের বিপরীতমুখী এবং অনমনীয় দাবিগুলো। রাশিয়ার দাবি- রাশিয়া কর্তৃক অবৈধভাবে দখল এবং পরবর্তীতে সংযুক্ত করা ক্রিমিয়া, ডনবাস, খেরসন ও জাপোরিঝিয়া অঞ্চলগুলোর ওপর রাশিয়ার সার্বভৌমত্বকে ইউক্রেনকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। ইউক্রেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাটো জোটে যোগদানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে এবং চিরতরে নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার করতে হবে। ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতা সীমিত করা এবং ভবিষ্যতে রাশিয়ার জন্য হুমকি হতে পারে এমন সামরিক কাঠামো বাদ দিতে হবে। অপরদিকে, ইউক্রেনের দাবি হচ্ছে- ১৯৯১ সালের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানার মধ্যে রাশিয়ার সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত সামরিক প্রত্যাহার করতে হবে, ইউক্রেনের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য ন্যাটোর অনুচ্ছেদ ৫-এর মতো শক্তিশালী নিরাপত্তা গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং যুদ্ধের কারণে হওয়া ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ (Reparations) প্রদান করতে হবে।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ কেবল একটি স্থানীয় সংঘাত নয়, এটি বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা স্থাপত্য, জ্বালানি এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা একটি গুরুতর বৈশ্বিক সংকট। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক এবং আরব বিশ্বের মতো শক্তিগুলো সামরিক সহায়তা, অর্থনৈতিক চাপ এবং কূটনৈতিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে সংঘাতের মূল কারণ—ন্যাটো সম্প্রসারণের বিষয়ে রাশিয়ার নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব রক্ষার আকাঙ্ক্ষা—এই দুই পক্ষের বিপরীতমুখী ও অনমনীয় অবস্থান কোনো পক্ষকে ছাড় দিতে রাজি হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মস্কো অধিকৃত ভূখণ্ড নিয়ে তার অবস্থান থেকে সরে না আসে এবং ইউক্রেন তার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আপস না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি টেকসই এবং ন্যায্য শান্তি অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থেকে যাবে। সংঘাতের সমাপ্তি নির্ভর করছে এই দুই প্রধান দাবির মধ্যে একটি কার্যকর কূটনৈতিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়ার ওপর।

গ. **মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা এবং ভারতের সাথে তিস্তা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের করনীয়গুলি কী হতে পারে তা উল্লেখ করুন।**

নমুনা উত্তর : রোহিঙ্গা সংকটের সূত্রপাত ঘটে মূলত ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে, যখন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা, নিপীড়ন ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন শুরু হয়। এই বর্বরতার ফলস্বরূপ প্রায় ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। আট বছর পেরিয়ে গেলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় একদিকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ কমছে, তেমনি অন্যদিকে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে সন্ত্রাস, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তার বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশকে দ্রুত ও টেকসই সমাধানে পৌঁছানোর জন্য বহুমাত্রিক কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

১. জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রোডম্যাপ বাস্তবায়ন ও তহবিল সংগ্রহ :

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে জাতিসংঘ এবং এর সংশ্লিষ্ট ফোরামকে সক্রিয় করার কোনো বিকল্প নেই। এই বিষয়ে বাংলাদেশের করণীয়গুলো হলো:

*** ড. ইউনূসের প্রস্তাব অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ :** অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনসহ উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় এই সংকটকে "তাজা টাইম বোমা" আখ্যা দিয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি কার্যকর রোডম্যাপ হিসেবে তুলে ধরতে হবে। তাঁর প্রস্তাবনার আলোকে বাংলাদেশের করণীয়:

*** আন্তর্জাতিক সংকল্প নিশ্চিতকরণ :** গত ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের রোহিঙ্গা সম্মেলন এবং অন্যান্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা থেকে প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সংকল্পকে কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গাদের জন্য একটি সময়-নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা (Roadmap) বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।

*** মানবিক তহবিল বৃদ্ধি :** তহবিল সংকটের কারণে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মাসিক রেশন কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর কাছে নতুন ও বর্ধিত তহবিল নিশ্চিত করার জন্য জোরালোভাবে প্রচারণা চালাতে হবে।

*** আইনি ও বিচারিক জবাবদিহিতা :** আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আন্তরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে হবে।

*** নিরাপদ অঞ্চল গঠনের চাপ :** জাতিসংঘ ও ইউএনএইচসিআর-এর তত্ত্বাবধানে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে 'নিরাপদ অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব নিয়ে কাজ করা, যা প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে।

২. চীন ও ভারতের প্রভাব কাজে লাগিয়ে প্রত্যাবাসনে চাপ :

মিয়ানমারের প্রতিবেশী এবং অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে চীন ও ভারতের সঙ্গে কৌশলগতভাবে কাজ করা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। এই দুটি দেশের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে চাপ সৃষ্টি করা বাংলাদেশের প্রধান করণীয়:

*** ভারতের সক্রিয় ভূমিকা :** এই সমস্যার টেকসই সমাধান খুঁজতে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো। ভারত তার কূটনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে মিয়ানমারকে সংকটের মূল কারণগুলো মোকাবিলা করতে এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করতে পারে।

*** চীনের চাপ প্রয়োগ :** মিয়ানমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীনের উচিত মিয়ানমারের ওপর তার চাপ বৃদ্ধি করা এবং সামরিক জান্তাকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে রাজি করাতে রাজি করানো।

৩. পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে অংশীদারিত্ব :

*** যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর ব্যবস্থা:** যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে চাপ বজায় রাখতে উৎসাহিত করতে হবে। মিয়ানমারের ওপর আরও কঠোর অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গাদের জন্য ২০২২ সালে প্রায় ১৯ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের নতুন সহায়তা ঘোষণার মতো সহায়তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ করা।

*** ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা :** ইউরোপীয় ইউনিয়নকে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সহিংসতা বন্ধের জন্য মিয়ানমার সামরিক জান্তার ওপর আরও কঠোর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপে উৎসাহিত করা।

*** আন্তর্জাতিক সমর্থন অটুট রাখা:** পশ্চিমা বিশ্বের ১১টি দেশসহ দাতা দেশগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং তাদের দেওয়া পাশে থাকার অঙ্গীকার ধরে রাখা। ইইউকে রোহিঙ্গাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও শিক্ষা খাতে সহায়তার জন্য অনুরোধ করা।

৪. অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা : রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে দমন করা।

শরণার্থী শিবিরের চাপ হ্রাস : দীর্ঘদিন শরণার্থী শিবিরে থাকা রোহিঙ্গাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভাসানচরের মতো উন্নত অবকাঠামো ব্যবহার করে কক্সবাজারের চাপ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া।

রাখাইনে রাজনৈতিক সমাধান : ড. ইউনূসের প্রস্তাবের আলোকে রাখাইনে সব জাতিসত্তার অংশগ্রহণে এমন একটি বন্দোবস্তের জন্য চাপ দেওয়া, যেন রোহিঙ্গারা সম-অধিকার ও নাগরিকত্বসহ সমাজের অংশ হতে পারে।

অপরদিকে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জীবনধারা তিস্তা নদী আজ ভারতের একতরফা পানি আগ্রাসনের শিকার। শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রত্যাহার করে এবং বর্ষা মৌসুমে কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই গজলডোবা বাঁধের সব গেট খুলে দিয়ে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে ভারত বারবার তিস্তাপাড়ের মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করছে। এই অমানবিক আচরণ দেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ফল বলে জনগণ মনে করে। তিস্তার এই সমস্যা দলীয় নয়, বরং জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি এক গভীর হুমকি, যার স্থায়ী সমাধানে জাতিকে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

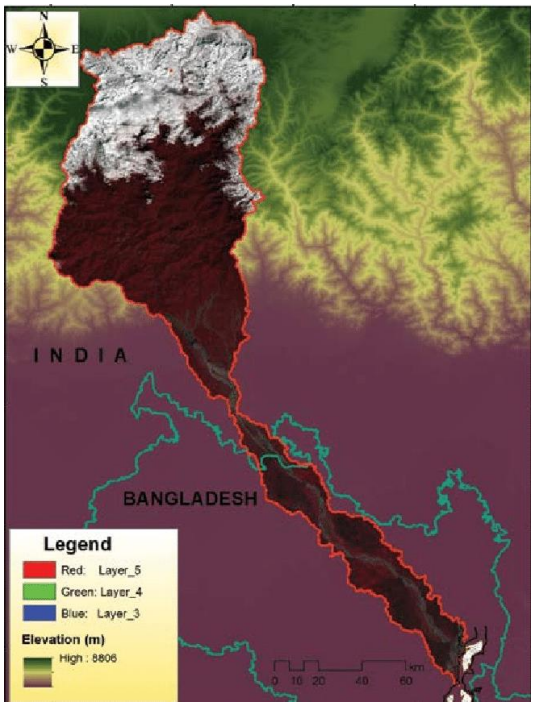

ভারতের একতরফা পানি আগ্রাসন এবং শুষ্ক ও বর্ষা উভয় মৌসুমেই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের ওপর সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় নিম্নলিখিত করণীয়গুলো গ্রহণ করা অপরিহার্য:

১. জাতীয় ঐকমত্য গঠন ও শক্তিশালী কূটনৈতিক অবস্থান : তিস্তা সমস্যা যেহেতু কোনো দলীয় নয়, বরং দেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন, তাই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে জরুরি। যেমন-

*** মেরুদণ্ডহীনতার অবসান :** বাংলাদেশের সরকারগুলোর "মেরুদণ্ডহীনতার" কারণেই ভারত প্রতি বছর এই অমানবিক আচরণ করতে পারছে। বিশেষত, বিগত ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের নতজানু নীতি ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা তিস্তা সমস্যার সমাধানে ভারতের আগ্রহের ঘাটতি তৈরি করেছে। এই অবস্থান থেকে সরে এসে দেশপ্রেমিক শক্তির সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

*** অমীমাংসিত চুক্তি :** বিগত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার আন্তরিকভাবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা করতে চেয়েছিল বলে এদেশের মানুষ মনে করে না; এটি বরাবরই ছিল তাদের রাজনীতির খেলা। এর সুযোগ নিয়ে ভারত ১৯৯৭ সালের আন্তর্জাতিক পানিপ্রবাহ কনভেনশন লঙ্ঘন করে একতরফা পানি প্রত্যাহার করেছে।

*** ট্রানজিটের বিনিময়ে ব্যর্থতা :** বিনা প্রতিদানে ভারতকে ট্রানজিট, ট্রান্সশিপমেন্ট, বন্দর, নৌপথ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে বিগত সরকার বাংলাদেশের দাবি আদায়ের সুযোগ হ্রাস করেছে। এই নীতি পরিহার করে 'বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)' কর্তৃক প্রস্তাবিত 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' নীতি বিবেচনায় নিতে হবে।

*** জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও গণ-আন্দোলন :** তিস্তা সমস্যাকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে দেশের এবং সমগ্র জাতির সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের অভ্যন্তরে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ঐতিহাসিক লংমার্চের মতো প্রতিবাদের চেতনাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে তিস্তা সমস্যার সমাধানে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

২. আন্তর্জাতিক আইনি ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ : ভারতের পানি আগ্রাসনকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরে বৈশ্বিক জনমত এবং আইনি চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

*** জাতিসংঘের কনভেনশন ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক আইনি চাপ সৃষ্টি :** বাংলাদেশ যেহেতু সম্প্রতি জাতিসংঘের পানি কনভেনশনে যোগ দিয়েছে, তাই এখন প্রধান করণীয় হলো এই আইনি কাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। এই কনভেনশনের নীতি অনুসারে সীমান্তপারের পানির ন্যায্য ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো দাবি তুলতে হবে।

*** আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি :** ভারতের এই নীতিহীন কার্যক্রম ও পানি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিকার চাইতে হবে এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে। তিস্তা পারের মানুষের মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে হবে।

*** বিশ্ব জনমত গঠন :** বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের পানি শোষক চরিত্র ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানাতে হবে যে, উজানের দেশ কি চাইলেই বন্যা সৃষ্টি করে তার প্রতিবেশী দেশকে ডুবিয়ে মারতে পারে?

৩. তিস্তা মহাপরিকল্পনার দ্রুত ও দেশীয় উপায়ে বাস্তবায়ন : তিস্তা সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য নদীর পরিবেশ ও উত্তরাঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার কথা মাথায় রেখে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন জরুরি।

*** বিগত সরকারের সদিচ্ছার অভাব :** ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার সারাদেশে ৩ লাখ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প হাতে নিলেও রংপুর বিভাগের জন্য কোনো মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেনি, যা এ অঞ্চলের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণের ইঙ্গিত দেয়। এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করে মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

*** দ্রুত ও স্বচ্ছ বাস্তবায়ন :** তিস্তা মহাপরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়ন এখন জরুরি। তিস্তা নদী কেবল ভূগোলের অংশ নয়, এটি উত্তরাঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

*** চীনা প্রকল্প নিয়ে কৌশল :** চীন কিংবা ভারত কারও ঋণ নিয়েই প্রশ্নবিদ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না। 'পাওয়ার-চায়না'-এর প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা, যা নদীর প্রস্থ মারাত্মকভাবে হ্রাস করার এবং গভীরতা দ্বিগুণ করার কথা বলে, তা তিস্তার বালুময় অববাহিকার জন্য আশঙ্কাজনক। বাংলাদেশের উচিত হবে চীনের এই প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর না হওয়া।

*** দেশীয় পারদর্শিতার ওপর নির্ভরতা :** বিদেশি অর্থায়ন, পরামর্শ ও তথাকথিত পারদর্শিতার পেছনে না ছুটে, দেশের অবস্থার জন্য উপযোগী, দেশীয় পারদর্শিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে তিস্তা অববাহিকার পুনরুজ্জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। তিস্তার সব শাখা-প্রশাখার সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সব পুরোনো খাল, নালা, বিল ও অন্যান্য জলাধার পুনরুদ্ধার করতে হবে।

রোহিঙ্গা এবং তিস্তা—এই দুটি সমস্যাই বাংলাদেশের জন্য বহুমাত্রিক, দীর্ঘমেয়াদী এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট যেখানে মানবিক বিপর্যয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে, সেখানে ভারতের তিস্তা আগ্রাসন উত্তরাঞ্চলের মানুষের জীবন, জীবিকা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এই দ্বৈত সংকটের স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের প্রধান করণীয় হলো জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া এবং কূটনৈতিক কৌশলে "নতজানু" অবস্থান পরিহার করে "মেরুদণ্ডবিশিষ্ট" নীতি গ্রহণ করা। এর জন্য প্রথমত, উভয় সংকটে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বিগত ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের নতজানু নীতি ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্ত অবস্থান নেওয়া জরুরি।

ঘ. যুদ্ধোত্তর গাজা উপত্যকাকে নিয়ে নতুন ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগুলি লিখুন। এই বাস্তবতায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আদৌ সম্ভব বলে মনে করেন কী? পর্যালোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের দ্বারা দক্ষিণ ইসরায়েলে এক বিশাল ও সমন্বিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের দ্বারা পরিচালিত একটি আক্রমণ যার নাম ছিল 'অপারেশন আল-আকসা ফ্ল্যাড' (Operation Al-Aqsa Flood)। এর প্রত্যুত্তরে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী তাদের অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন আয়রন সোর্ডস' (Operation Iron Swords)। এই আক্রমণে প্রায় ১,২০০ ইসরায়েলি এবং বিদেশী নাগরিক নিহত হন এবং ২৫০ জনেরও বেশি মানুষকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই আক্রমণের প্রত্যুত্তরে, ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় সর্বাত্মক বিমান হামলা ও পরবর্তীতে স্থল অভিযান শুরু করে।

যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ছিল নজিরবিহীন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যানুযায়ী, এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৭০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু রয়েছে। আহত হয়েছেন ১,৩০,০০০ জনেরও বেশি মানুষ। ইসরায়েলি হামলায় গাজার প্রায় ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা অর্থাৎ ১৯ লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে চরম মানবেতর জীবনযাপন করেছে। গাজার জনবহুল এলাকাগুলোতে স্কুল, হাসপাতাল, মসজিদ এবং বসতবাড়িসহ ৬০ শতাংশের বেশি অবকাঠামো হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নতুবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। মানবিক ত্রাণ ও খাদ্য সরবরাহে ইসরায়েলি অবরোধের কারণে গাজার কিছু অংশে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এই সংঘাত কেবল গাজা উপত্যকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে লেবানন এবং ইয়েমেনের মতো অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল, যা মধ্যপ্রাচ্যে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

বর্তমানে ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর থেকে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর রয়েছে। এই চুক্তিটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর এবং কাতারের মধ্যস্থতায় করা একটি শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। এই চুক্তির ফলে যুদ্ধকালীন সময়ের তুলনায় সামরিক অভিযান ও গোলাগুলির তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং গাজায় মানবিক সহায়তার প্রবেশ বেড়েছে। যদিও এই যুদ্ধবিরতি আনুষ্ঠানিকভাবে বহাল আছে, তবুও এটি অত্যন্ত ভঙ্গুর। উভয় পক্ষই চুক্তি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করছে। বিশেষত ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা অব্যাহত থাকায় এবং হামাসের পক্ষ থেকে আক্রমণ বা হুমকি স্বরূপ কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠায়, যুদ্ধবিরতি প্রায় প্রতিদিনই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জিম্মি ও বন্দীদের বিনিময়ের প্রক্রিয়া চলছে, কিন্তু পরিস্থিতি এখনো যেকোনো মুহূর্তে বড় আকারের সংঘাতের দিকে মোড় নিতে পারে।

গাজা উপত্যকার দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর মধ্যপ্রাচ্য এখন এক জটিল ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে। ইসরাইলি দৈনিক Yedioth Ahronoth-এর তথ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হামাসকে নিরস্ত্রীকরণসহ তাঁর ঘোষিত মৌলিক শর্তগুলো থেকে কার্যত পিছিয়ে এসেছেন, যা গাজার ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে। এই অবস্থায়, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে।

যুদ্ধোত্তর গাজা উপত্যকাকে ঘিরে নতুন ভূ-রাজনৈতিক কৌশলসমূহ :

যুদ্ধবিরতির পর গাজার প্রশাসন, নিরাপত্তা ও পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে হোয়াইট হাউসের প্রস্তাবিত রোডম্যাপ, আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশল এবং আঞ্চলিক অংশীদারদের অবস্থান এই ভূ-রাজনৈতিক চালচিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১. **যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল ও পশ্চিমা জোটের কৌশল :** নিয়ন্ত্রিত ট্রানজিশন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ হোয়াইট হাউসের প্রস্তাব এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা চাহিদা এই কৌশলের মূল ভিত্তি। এর প্রধান লক্ষ্য হলো গাজাকে হামাসমুক্ত করে একটি দুর্বল, নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তী প্রশাসন ও ট্রাম্পের নেতৃত্ব : হোয়াইট হাউসের প্রস্তাবে গাজা একটি 'অরাজনৈতিক ফিলিস্তিনি কমিটি' দ্বারা পরিচালিত অন্তর্বর্তী শাসনের অধীনে থাকার কথা বলা হয়েছে। এই কমিটির কাজ তদারকি করবে 'বোর্ড অব পিস' নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার সভাপতি হবেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং যার সদস্য হিসেবে থাকবেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। এই মডেলের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের নামে পশ্চিমা-ইসরাইলি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।
আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (ISF) : এই কৌশলের অংশ হিসেবে গাজায় অস্থায়ীভাবে 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স (ISF)' মোতায়েন করা হবে, যা গাজার পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেবে এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এই বাহিনীর মোতায়েনের পরই ইসরাইল ধাপে ধাপে সেনা প্রত্যাহার করবে। এটি সরাসরি দখলদারিত্ব এড়িয়ে পরোক্ষভাবে ইসরাইলের নিরাপত্তা অধিকার বজায় রাখার কৌশল।
অর্থনৈতিক শর্তারোপ : ট্রাম্প একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছেন। এর মাধ্যমে পুনর্গঠন ও সহায়তা প্রদানকে হামাসমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নতুন প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক শর্তারোপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
হামাসকে নির্বাসনে উৎসাহ: চুক্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অস্ত্র জমা দিলে হামাস সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা এবং যারা গাজা ছাড়তে চায় তাদের নিরাপদে অন্য দেশে পাঠানোর প্রস্তাব রয়েছে। এটি হামাসকে সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করার একটি কূটনৈতিক কৌশল।

২. **আরব শক্তি ও গ্লোবাল সাউথের কৌশল :** আঞ্চলিক ভারসাম্য ও নৈতিক চাপ মিসর, কাতার এবং অন্যান্য আরব শক্তি গাজার প্রশাসনে নিজেদের প্রভাব রাখতে আগ্রহী। অন্যদিকে গ্লোবাল সাউথ আন্তর্জাতিক নৈতিক চাপ বজায় রাখছে।

আরব মধ্যস্থতা ও নিশ্চয়তা: হোয়াইট হাউসের প্রস্তাবটি মূলত যুক্তরাষ্ট্র, মিসর ও কাতারের যৌথ প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এতে আঞ্চলিক অংশীদারদের কাছে হামাস ও অন্যান্য দল কোনো হুমকি সৃষ্টি করবে না—এমন নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আরব দেশগুলো গাজার নিরাপত্তা ও প্রশাসনে কৌশলগত অংশীদারিত্ব লাভ করবে।
নৈতিক কূটনীতি ও ন্যায়ভিত্তিক শান্তি : বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কের মতো গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রস্বীকৃতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে পশ্চিমা আধিপত্যবাদী পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে 'ন্যায়ভিত্তিক শান্তি কাঠামো'র দাবি তুলেছে। এই নৈতিক অবস্থান আন্তর্জাতিক জনমতকে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে রাখতে সাহায্য করছে।

ঐক্য সরকারের সুযোগ : ২০২৪ সালের 'বেইজিং ঘোষণা' দ্বারা হামাস-ফাতাহর ঐক্য সরকারের আলোচনা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ত্বরান্বিত হয়েছে। হামাসও শর্তসাপেক্ষে ঐক্য সরকারের অংশ হতে আগ্রহী হওয়ায়, এটি ফিলিস্তিনিদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

৩. **ইসরাইলের কৌশল :** সামরিক সুবিধা ধরে রাখা ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ নেতানিয়াহু প্রকাশ্য শর্ত পূরণ করতে না পারলেও, তিনি সামরিকভাবে সুবিধা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।

নিরাপত্তা অঞ্চল ও নিয়ন্ত্রণ : ইসরাইল গাজার উত্তর অংশে 'নিরাপত্তা অঞ্চল' ধরে রাখার কৌশল নিয়েছে। তারা গাজায় সরাসরি শাসন না করেও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায় এবং পুনর্গঠনের ভার আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে করিয়ে নিতে চায়, যা আন্তর্জাতিক আইনের সমালোচনার মুখেও যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থনে কার্যকর রয়ে গেছে।
যুদ্ধোত্তর গাজার ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং হোয়াইট হাউসের শর্তসাপেক্ষ প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বল্পমেয়াদে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। তবে দীর্ঘমেয়াদে এটি অসম্ভব নয়, যা নির্ভর করছে ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং গ্লোবাল সাউথের সংহতির ওপর।

স্বাধীনতার পথে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ :

পশ্চিমা প্রস্তাবের শর্তাধীন স্বাধীনতা : হোয়াইট হাউসের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, গাজার পুনর্গঠন ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কার কর্মসূচি সম্পন্ন হওয়ার পরই আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতো একটি বিশ্বাসযোগ্য পথ তৈরি হবে। এর মানে হলো, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা পশ্চিমা-নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর নির্ভরশীল, যা ফিলিস্তিনিদের 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পরিপন্থী'।

হামাসকে বর্জন ও বিভেদ : হোয়াইট হাউসের প্রস্তাবের মূল শর্ত হলো গাজার শাসনে হামাস বা অন্য কোনো দলের সরাসরি, পরোক্ষ ভূমিকা থাকবে না। এটি হামাসের জনসমর্থন এবং 'প্রতিরোধের প্রতীক' হিসেবে তাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা পুরোপুরি অস্বীকার করে। হামাস ও ফাতাহর মধ্যে গভীর আস্থাহীনতা স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় একক প্রশাসন গঠনে বারবার বাধা সৃষ্টি করছে।

জেরুজালেম ও আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন : ইসরাইল তার রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমকে ঘোষণা এবং অধিকৃত আরব এলাকা ফিরিয়ে না দেওয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘের ২৪২ ও ৩০৮ নং প্রস্তাব সহ আন্তর্জাতিক আইন বারবার লংঘন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পরাশক্তিগুলো ইসরাইলের এই অপরাধে অস্ত্র জোগান ও নীরব সমর্থন দেওয়ায় জাতিসংঘের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের বিপদ : 'বোর্ড অব পিস' এবং 'অরাজনৈতিক কমিটি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন স্থানীয় প্রতিনিধিত্বহীন হওয়ায় অনেক ফিলিস্তিনি এটিকে 'নতুন ঔপনিবেশিক কাঠামো' হিসেবে দেখছেন। এমন প্রশাসন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হলে দীর্ঘমেয়াদী অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে।

স্বাধীনতার পথে সম্ভাবনার আলোকরেখা :

প্রতিরোধের প্রমাণিত সক্ষমতা : নেতানিয়াহুর মূল শর্তগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে যে, ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র প্রতিরোধকে দমন করা কঠিন। ৭ অক্টোবরের 'আল-আকসা ফ্লাড' অভিযান দশক ধরে চলতে থাকা 'শান্তিপ্রক্রিয়ার' ব্যর্থতা এবং ফিলিস্তিনিদের অবিনাশী মনোবল আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরেছে।

নৈতিক জাগরণ ও গ্লোবাল সাউথ : ইসরাইলের গণহত্যা ও 'দাহিয়া ডকট্রিন' প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় বিশ্বজুড়ে নৈতিক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার অভিযোগ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আইনি ও নৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করেছে।

জনগণের আকাঙ্ক্ষা : গাজার জনগণের কিংবদন্তিতুল্য সহিষ্ণুতা প্রমাণ করেছে যে, তাদের রাষ্ট্রীয় ধারণাকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে তা স্বাধীনতার পথে শক্তিশালী পদক্ষেপ হবে।

গাজা সংঘাতের পর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি এখন ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার 'নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে' বন্দী। যেখানে পশ্চিমা শক্তিগুলো ইসরাইলের নিরাপত্তার মোড়কে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে পারে কেবল তখনই, যখন ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব হামাস-ফাতাহ বিরোধ মিটিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসন গঠনে সফল হবে এবং গ্লোবাল সাউথের সংহতি ও আন্তর্জাতিক আইনি চাপ ইসরাইল ও তার মিত্রদের ওপর থেকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করবে। এই সংঘাত প্রমাণ করেছে যে, ফিলিস্তিনিদের অবিনাশী মনোবলই একমাত্র চূড়ান্ত সাফল্য, যা একদিন তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে।

বিজ্ঞান : ২

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

(যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন) **নম্বর**

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের উত্তরে মূল বিষয়টি তুলে ধরে উদাহরণ ও চিত্রসহ (ক্ষেত্রবিশেষে) লিখলে ফুল মার্কস দিবেন প্লিজ।
iii. উদাহরণ ও চিত্র ছাড়া মূল বিষয়টি তুলে ধরলে ৫০% নম্বর দিতে পারেন।
iv. প্রশ্নের উত্তরে মূল বিষয়টি উঠে না আসলে শুন্য দিবেন।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।
vi. খাতা মূল্যায়ন শেষে খাতার দ্বিতীয় বা শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান অংশের জন্য আলাদাভাবে ৪/৫টি মন্তব্য লিখে দিবেন প্লিজ।

১. **ক. আলো কী? আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব আলোচনা করুন।** ২.৫

উত্তর : আলো হলো এক প্রকার শক্তি যা চোখে প্রবেশ করে দেখার অনুভূতি তৈরি করে এবং এটি একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা সরলরেখায় চলাচল করে। এটি দৃশ্যমান বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলে এবং এর নিজস্ব বেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 3×10^8 মিটার।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৬৪ সালে তার তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব অনুসারে, আলো একটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ যা দোদুল্যমান বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা গঠিত। এই তত্ত্বটি তড়িৎ, চুম্বকত্ব এবং আলোকে একই শক্তির ভিন্ন রূপ হিসেবে একীভূত করে। এর চলমান রূপ নিচের চিত্রের মতো।

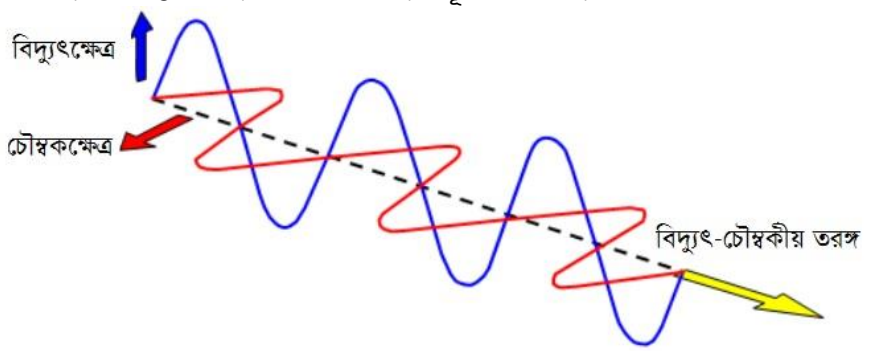

খ. পূর্ণ অভ্যন্তীরণ প্রতিফলন কী? আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে প্রথমে আলো দেখা যায় এবং পরে শব্দ শোনা যায় কেন? ৩

উত্তর : আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় যদি আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বেশি হয়, তবে আলোকরশ্মি আর হালকা মাধ্যমে প্রতিসৃত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে ঘন মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। আলোর এ ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে প্রথমে আলো দেখা যায় এবং পরে শব্দ শোনা যায়, এর প্রধান কারণ হলো আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে অনেক বেশি। শূন্যস্থানে আলোর গতি হলো প্রায় 3×10^8 মিটার/সেকেন্ড এবং সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের গতি হলো মাত্র প্রায় ৩৪৩ মিটার/সেকেন্ড। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর ঘটনাটি (আলো ও শব্দ সৃষ্টি) একই সময়ে ঘটে। কিন্তু আলো যেহেতু শব্দের তুলনায় প্রায় দশ লক্ষ গুণ দ্রুত গতিতে চলে, তাই আমরা বিদ্যুৎ চমকানো মাত্রই আলো দেখতে পাই এবং বিদ্যুৎ চমকানোর কয়েক সেকেন্ড পরে আমরা শব্দের তরঙ্গ (অর্থাৎ বজ্রপাতের আওয়াজ) শুনতে পাই।

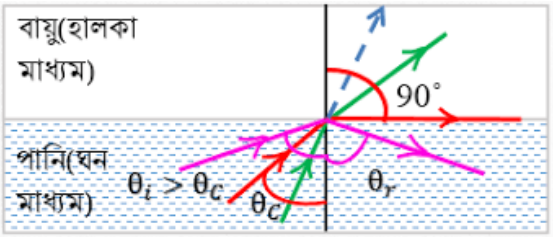

গ. **LASER কী? এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার আলোচনা করুন।** ২

উত্তর : LASER এর পূর্ণরূপ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। এটি একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একবর্ণী, সুসঙ্গত ও অত্যন্ত তীব্র আলোকরশ্মি তৈরি হয়।

লেজারের বৈশিষ্ট্য :

একবর্ণী : প্রায় একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো।

সুসঙ্গত : একই দশায় থাকা তরঙ্গ।

উচ্চ তীব্রতা : ক্ষুদ্র অঞ্চলে শক্তির ঘনীভূত রূপ।

লেজারের ব্যবহার :]

চিকিৎসা : রক্তপাতহীন সার্জারি, চক্ষু চিকিৎসা (LASIK)।

শিল্প : ধাতু কাটা, ঢালাই, নিখুঁত পরিমাপ।

যোগাযোগ : অপটিক্যাল ফাইবারে উচ্চ-গতির ডেটা স্থানান্তর।

গবেষণা/অন্যান্য : হোলোগ্রাফি, লেজার প্রিন্টার, সিডি/ডিভিডি।

২. ক. **প্রতিধ্বনি কী? প্রতিধ্বনির সাহায্যে কীভাবে একটি কূপের গভীরতা নির্ণয় করা যায় তা লিখুন।** ২.৫

উত্তর : কোনো শব্দ উৎস থেকে শব্দ করা হলে তা কোনো কঠিন তল থেকে বাধাগ্রস্ত হয়ে আবার শব্দের উৎসের নিকট ফিরে আসে, তখন সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি শোনা যায়। শব্দের এই পুনরাবৃত্তিকেই প্রতিধ্বনি বলে। প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব 16.6 মিটার থাকা প্রয়োজন।

প্রতিধ্বনির সাহায্যে খুব সহজে কূপের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। কূপের উপরে কোনো শব্দ উৎপন্ন করলে সেই শব্দ কূপের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এখন শব্দ উৎপন্ন করা ও সেই শব্দের প্রতিধ্বিনি শোনার মধ্যবর্তী সময় থামা ঘড়ির সাহায্যে নির্ণয় করে কূপের গভীরতা নির্ণয় করা যায়।

ধরা যাক,

কূপের গভীরতা = h, শব্দ উৎপন্ন করা ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় = t এবং শব্দের বেগ = v

এখন শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর কূপের গভীর থেকে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার কাছে ফিরে আসতে মোট 2h দূরত্ব অতিক্রম করলে, মোট দূরত্ব 2h = শব্দের গতি ×সময় = v × t

$\therefore h = \frac{v\times t}{2}$; এখানে শর্ত থাকে যে, কুপের গভীরতা ১৬.৬ মিটারের বেশি হতে হবে।

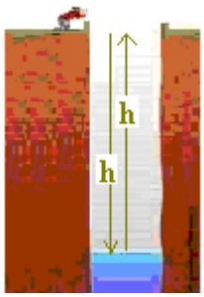

খ. **ডপলার ক্রিয়া কী? ডপলার ক্রিয়ার বাস্তব দুটি উদাহরণ ব্যাখ্যাসহ দিন।** ২.৫

উত্তর : তরঙ্গ সৃষ্টিকারী উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতির কারণে পর্যবেক্ষক কর্তৃক অনুভূত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে আপাত পরিবর্তন হয়, তাকে ডপলার ক্রিয়া (Doppler Effect) বলে। উৎস ও পর্যবেক্ষক পরস্পরের দিকে এগোলে কম্পাঙ্ক বেড়ে যায় (তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে), আবার দূরে সরে গেলে কম্পাঙ্ক কমে যায় (তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়ে)।

বাস্তব উদাহরণ:

ট্রেন কাছে এলে : যখন একটি ট্রেন হর্ন বাজাতে বাজাতে পর্যবেক্ষকের দিকে এগিয়ে আসে, তখন হর্নের শব্দের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শব্দটি পর্যবেক্ষকের কাছে তীক্ষ্ণ বা উচ্চ পিচযুক্ত শোনায়।

ট্রেন দূরে গেলে : যখন ট্রেনটি পর্যবেক্ষককে অতিক্রম করে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন উৎস (হর্ন) ও পর্যবেক্ষকের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে। ফলে অনুভূত শব্দের কম্পাঙ্ক হ্রাস পায়। শব্দটি পর্যবেক্ষকের কাছে মোটা বা নিম্ন পিচযুক্ত শোনায়।

গ. **শব্দ দূষণ কী? শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি লিখুন।** ২.৫

উত্তর : শব্দ দূষণ (Noise Pollution) হলো মানুষের কান ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্য অস্বস্তিকর, অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর মাত্রার শব্দ। যখন শব্দের তীব্রতা বা কম্পাঙ্ক সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করে পরিবেশকে দূষিত করে, তখন তাকে শব্দ দূষণ বলা হয়।

শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ : শব্দ দূষণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং এটি মানব স্বাস্থ্য, জীবজন্তু এবং সামগ্রিক পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

* **শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস :** একটানা উচ্চ তীব্রতার (সাধারণত ৮০ ডেসিবেল বা তার বেশি) শব্দ শুনলে কানের ভেতরের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে আংশিক বা স্থায়ী বধিরতা দেখা দিতে পারে।

* **মানসিক ও স্নায়বিক সমস্যা :** শব্দ দূষণ উদ্বেগ (Anxiety), বিরক্তি, মানসিক চাপ (Stress) এবং মেজাজ খিটখিটে হওয়ার অন্যতম কারণ। এটি মনোযোগের ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়।

* **ঘুমের ব্যাঘাত :** রাতে উচ্চ শব্দ ঘুমের স্বাভাবিক চক্রে ব্যাঘাত ঘটায়, যা দীর্ঘমেয়াদে অনিদ্রা এবং শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

* **হৃদপিণ্ড ও রক্তচাপের সমস্যা :** শব্দ দূষণের কারণে অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ বাড়ে, যা হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করে এবং উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

* **ক্লান্তি ও কর্মক্ষমতা হ্রাস :** ক্রমাগত গোলমালের মধ্যে থাকলে ক্লান্তি আসে এবং শিক্ষার্থী ও কর্মীদের পড়াশোনা ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা কমে যায়।

* **প্রজননে সমস্যা :** অতিরিক্ত শব্দ অনেক প্রাণীর প্রজনন চক্রে ব্যাঘাত ঘটায় এবং শিকারী প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

* **জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি :** জলজ পরিবেশে জাহাজের ইঞ্জিন বা সিসমিক সার্ভের শব্দ তিমি ও ডলফিনের মতো প্রাণীদের দিক নির্ণয় ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে মারা যায়।

৩. ক. **টর্ক কাকে বলে? প্রাকৃতিক চুম্বক এবং কৃত্রিম চুম্বকের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।** ২.৫

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং ঘূর্ণন অক্ষ থেকে ঐ বলের প্রয়োগ বিন্দুর লম্ব দূরত্বের গুণফলকে টর্ক বলে।
টর্ক = প্রযুক্ত বল (F) × ঘূর্ণন অক্ষ থেকে বলের প্রয়োগ বিন্দুর লম্ব দূরত্ব (r)

পার্থক্যের ভিত্তি	প্রাকৃতিক চুম্বক (Natural Magnets)	কৃত্রিম চুম্বক (Artificial Magnets)
উৎস	প্রকৃতিতে সরাসরি পাওয়া যায় (যেমন: আকরিক)।	মানুষের তৈরি, চৌম্বক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে চুম্বকিত করে তৈরি করা হয়।
আকার	নির্দিষ্ট বা নিয়মিত আকার নেই, অনিয়মিত আকারের হয়।	প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারে তৈরি করা যায় (যেমন: দণ্ড, শলাকা, অশ্বক্ষুরাকৃতি)।
চুম্বকত্ব	এদের চুম্বকত্ব সাধারণত দুর্বল এবং স্থায়ী হয়।	এদের চুম্বকত্ব শক্তিশালী বা অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে স্থায়ী বা অস্থায়ী (তড়িৎ-চুম্বক) হতে পারে।
চুম্বকত্বের স্থায়িত্ব	সাধারণত স্থায়ী চুম্বক, তবে চুম্বকত্ব পরিবর্তনীয়।	প্রয়োজন অনুযায়ী স্থায়ী বা অস্থায়ী (তড়িৎ-চুম্বক) হিসেবে তৈরি করা হয়।
উদাহরণ	ম্যাগনেটাইট বা লোডস্টোন (Lodestone)।	দণ্ড চুম্বক, অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক, তড়িৎ-চুম্বক, স্পিকারের চুম্বক।
ব্যবহার	এদের দুর্বলতার কারণে ব্যবহার সীমিত (ঐতিহাসিকভাবে দিক নির্ণয়ে ব্যবহৃত হতো)।	ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে (মোটর, জেনারেটর, স্পিকার, শিল্প কারখানা, গবেষণা)।

খ. **ফেরোচৌম্বকত্ব কী? একটি ফেরোচুম্বককে কীভাবে প্যারাচুম্বকে পরিণত করা যায় বর্ণনা করুন।** ২.৫

উত্তর : ফেরোচুম্বকত্ব (Ferromagnetism) হলো কিছু পদার্থের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যার কারণে তারা বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারণের পরেও শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকত্ব বজায় রাখতে পারে। এর কারণ হলো পদার্থের অভ্যন্তরে থাকা ডোমেন নামক ক্ষুদ্র চৌম্বক অঞ্চলগুলোর বিন্যাস, যা বাহ্যিক ক্ষেত্র প্রয়োগে একই দিকে সজ্জিত হয় এবং সেই বিন্যাস ধরে রাখে। উদাহরণ: লোহা, নিকেল, কোবাল্ট।

প্যারা চুম্বক হল এমন পদার্থ যা চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে চুম্বকিত হয়, তবে এর চৌম্বকত্ব ফেরো চুম্বকের তুলনায় অনেক দুর্বল। একটি ফেরোচৌম্বক পদার্থকে প্যারাচৌম্বক পদার্থে পরিণত করার জন্য, এটিকে তার কিউরি তাপমাত্রা বা যুগল তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হবে। এই তাপমাত্রায়, ফেরোচৌম্বকের পারমাণবিক চৌম্বক মুহূর্তগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে পারে না, তাই এটি তার শক্তিশালী ফেরোচৌম্বক বৈশিষ্ট্য হারায় এবং দুর্বল প্যারাচৌম্বক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

গ. **'পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক'– ব্যাখ্যা করুন।** ২.৫

উত্তর : পৃথিবীকে একটি বিশাল চুম্বক হিসেবে বর্ণনা করা হয় কারণ পৃথিবীর ভেতরে চুম্বকত্ব সৃষ্টি করার মতো প্রাকৃতিক উপাদান এবং প্রক্রিয়া রয়েছে, যা পৃথিবীর একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field) তৈরি করে। এই চৌম্বক ক্ষেত্র আমাদের চারপাশের পরিবেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে তিনটি স্তর রয়েছে: ভূপৃষ্ঠ, ভূত্বক, এবং ভূকেন্দ্র। ভূকেন্দ্রের দুটি অংশ রয়েছে: তরল বাইরের কেন্দ্র এবং কঠিন অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র। বাইরের কেন্দ্র গঠিত হয়েছে গলিত লোহা (iron) এবং নিকেল (nickel) থেকে। এই তরল ধাতব পদার্থগুলি পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গতিশীল থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং বাইরের কেন্দ্রের ভেতর তরল লোহা এবং নিকেলের প্রবাহের কারণে ডাইনামো প্রভাব (geodynamo effect) সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর চারপাশে একটি বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। যখন লোহার মতো বিদ্যুৎ

পরিবাহী তরল পদার্থ পৃথিবীর কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং পৃথিবী ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে, তখন এর ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ তৈরি হয়। এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

একটি দণ্ড চুম্বককে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় তা সবসময় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে। ঝুলন্ত চুম্বকটিকে একটু এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণ দোল খেয়ে আবার উত্তর দক্ষিণ বরাবর অবস্থান নেবে। এ ঘটনা, থেকে অবশ্যই ধারণা করা যায় যে, একটি বাহ্যিক বল দণ্ড চুম্বকটির উপর ক্রিয়া করে তাকে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকতে বাধ্য করছে। পৃথিবীর সবজায়গায়ই এ ঘটনা দেখা যায়। এ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক।

৪. ক. **pH কী? দুটি করে জৈব ও অজৈব অ্যাসিডের নাম লিখুন এবং তাদের pH সম্পর্কে মন্তব্য করুন।** ২.৫

উত্তর : কোনো জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে ঐ দ্রবণের pH বলে।

$pH = -[\log H^+]$

জৈব অ্যাসিড হলো সেই অ্যাসিডসমূহ যেগুলিতে কার্বন পরমাণু থাকে এবং সাধারণত দুর্বল প্রকৃতির হয়। এগুলির pH সাধারণত ২.৫ থেকে ৫.৫ এর মধ্যে থাকে।

অ্যাসিডের নাম	রাসায়নিক সংকেত	pH সম্পর্কে মন্তব্য
১. অ্যাসেটিক অ্যাসিড	CH_3-COOH	এর pH সাধারণত ২.৪ থেকে ৩.৪ এর মধ্যে থাকে, যা নির্দেশ করে যে এটি সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয় না।
২. সাইট্রিক অ্যাসিড	$C_6H_8O_7$	এর pH সাধারণত ৩.০ থেকে ৩.৫ এর মধ্যে থাকে। এটি অন্যান্য দুর্বল অ্যাসিডের তুলনায় সামান্য বেশি অম্লীয় হতে পারে।

অজৈব অ্যাসিডগুলি খনিজ পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এগুলিতে সাধারণত কার্বন পরমাণু থাকে না। এদেরকে প্রায়শই শক্তিশালী অ্যাসিড হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলির pH সাধারণত ০ থেকে ৩ এর মধ্যে থাকে।

অ্যাসিডের নাম	রাসায়নিক সংকেত	pH সম্পর্কে মন্তব্য
১. হাইড্রোক্লোরিকঅ্যাসিড	HCl	পাতলা দ্রবণেও এর pH ১-এর কাছাকাছি বা তারও কম থাকে, যা নির্দেশ করে যে এটি জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয়।
২. সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4	এর pH ১-এর কাছাকাছি বা তারও কম থাকে, (যেমন ০.৫ বা ০.৩) থাকে। এটি খুব কম pH মানে অত্যন্ত তীব্র অম্লত্ব প্রকাশ করে।

খ. **ভিনেগার কী? এর রাসায়নিক সংকেত লিখুন। ভিনেগার দিয়ে আচার প্রক্রিয়াজাত করা হয় কেন?** ২.৫

উত্তর : অ্যাসিটিক এসিডের 6-10% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলা হয়। এর রাসায়নিক সংকেত CH_3-COOH । ভিনেগার ব্যবহার করে আচার বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত বা সংরক্ষণ করার প্রধান কারণ হলো এর উচ্চ অম্লতা (High Acidity), যা এটিকে একটি কার্যকর প্রাকৃতিক সংরক্ষণকারক করে তোলে।

১. ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধ : ভিনেগারের প্রধান উপাদান অ্যাসেটিক অ্যাসিড হলো একটি দুর্বল অ্যাসিড, কিন্তু এটি যথেষ্ট শক্তিশালী যা খাদ্যদ্রব্যে জীবাণু, বিশেষত পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন Clostridium botulinum), ইস্ট এবং ছত্রাকের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। অধিকাংশ ক্ষতিকারক জীবাণু ৪.৬ এর কম pH মাত্রায় বাঁচতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। ভিনেগার ব্যবহার করলে আচারের pH মাত্রা ৪-এর নিচে নেমে যায়, যা এটিকে সংরক্ষণ-বান্ধব করে তোলে।

২. স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি : ভিনেগার তার স্বতন্ত্র টক স্বাদের কারণে আচারের সামগ্রিক স্বাদকে উন্নত করে এবং একটি মনোরম সুগন্ধ যোগ করে, যা ঐতিহ্যবাহী খাদ্য সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩. প্রাকৃতিক সংরক্ষণ : ভিনেগার একটি প্রাকৃতিক উপাদান, তাই এটি কৃত্রিম রাসায়নিক সংরক্ষক (chemical preservatives) ছাড়াই খাদ্যকে দীর্ঘদিন তাজা রাখতে সাহায্য করে।

গ. **"সকল ক্ষারই ক্ষারক, কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়"–ব্যাখ্যা করুন।** ২.৫

উত্তর : ক্ষারক (Base) হলো এমন যেকোনো রাসায়নিক যৌগ যা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন H^+ গ্রহণ করতে পারে অথবা হাইড্রোক্সাইড আয়ন OH^- প্রদান করতে পারে এবং অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করে। ধাতব অক্সাইড (যেমন: কপার অক্সাইড, CuO এবং ধাতব হাইড্রোক্সাইড (যেমন: সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, NaOH উভয়ই ক্ষারকের উদাহরণ। কিন্তু এই ক্ষারকগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে- কিছু ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয়, আবার কিছু ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

যেসব ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোক্সাইড আয়ন OH^- উৎপন্ন করে, কেবলমাত্র তাদেরকেই ক্ষার (Alkali) বলা হয়। যেমন- সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড NaOH এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড KOH হলো ক্ষার। যেহেতু ক্ষার হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পানিতে দ্রবীভূত হওয়া, তাই বলা যায় যে ক্ষার মাত্রই ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। কিন্তু অনেক ক্ষারক যেমন- কপার

অক্সাইড CuO বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট $CaCO_3$, পানিতে অদ্রবণীয়; তাই তারা ক্ষারক হলেও ক্ষার নয়। অর্থাৎ, সকল ক্ষারকের মধ্যে শুধুমাত্র দ্রবণীয় অংশটিই ক্ষার হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বলা যায়, "সকল ক্ষারই ক্ষারক, কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়"।

৫. **ক. পলিমারকরণ কী? মনোমার থেকে কীভাবে পলিমার তৈরি করা হয় লিখুন।** ২.৫

উত্তর:

পলিমার (Polymer) শব্দটি গ্রিক শব্দ 'পলি' (poly) অর্থ বহু বা অনেক এবং 'মেরোস' (meros) অর্থ অংশ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ পলিমার বলতে একই ধরনের অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ যুক্ত হয়ে যে উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট বৃহদাকার অণু তৈরি হয় তাকে বোঝায়। এক কথায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পর পর যুক্ত হয়ে পলিমার অণু গঠন করে থাকে। যে ক্ষুদ্র অণু যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি হয় তাকে মনোমার (Monomer) বলা হয়। যেমন A যদি একটি মনোমার অণু হয় তবে তার পলিমার হবে-

$$nA \longrightarrow [-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-] \text{ বা } [-A-]_n$$

মনোমার থেকে পলিমার তৈরি :

এই প্রক্রিয়ায় মনোমার অণুগুলি (বিশেষত যেগুলিতে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে) কোনো ছোট অণুকে বাদ না দিয়েই সরাসরি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। মনোমারের দ্বিবন্ধন ভেঙে গিয়ে শৃঙ্খলটি দীর্ঘ হতে থাকে। সাধারণত উচ্চ চাপ, তাপমাত্রা এবং একটি সূচনা কণার উপস্থিতিতে এই বিক্রিয়া ঘটে।

বিক্রিয়া উদাহরণ: ইথিন মনোমার থেকে পলিথিন তৈরি।

$$n(CH_2 = CH_2) \xrightarrow{\text{উচ্চ তাপ ও চাপ}} -(CH_2 - CH_2)_n-$$

(ইথিন) → (পলিথিন)

খ. **সেলুলোজিক ও নন-সেলুলোজিক তন্তুর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।** ২.৫

উত্তর :

বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র	সেলুলোজিক তন্তু	নন-সেলুলোজিক তন্তু
সংজ্ঞা	এই তন্তুগুলি হলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা পদার্থের পলিমার (সেলুলোজ)। এটি এক প্রকার জাতীয় পদার্থ যা দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিভিন্ন অংশ বা কোষ গঠিত হয়।	এই তন্তুগুলি প্রাকৃতিক সেলুলোজ নয় এমন পদার্থ, যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পলিমারকরণ দ্বারা গবেষণাগারে তৈরি করা হয়।
প্রধান উপাদান	সেলুলোজ	নাইলন, পলিয়েস্টার, অ্যাক্রাইলিক, অ্যারামিড, স্প্যানডেক্স, পলিপ্রপিলিন ইত্যাদি।
তাপ সংবেদনশীলতা	উচ্চ তাপমাত্রায় হলুদ হয়ে যায় বা পুড়ে যায়।	উচ্চ তাপমাত্রায় গলে যায় বা নরম হয়ে যায়।
উৎপাদন প্রক্রিয়া	সেলুলোজকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় (যেমন ছোট আঁশের তুলা, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি)।	রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পলিমারকরণ দ্বারা তৈরি।
ব্যবহার	রেয়ন এবং সেলুলোজ অ্যাসিটেট বস্ত্র তৈরিতে, রেয়ন গাড়ির টায়ারের লাইনিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	কার্পেট, দড়ি, টায়ার, বিভিন্ন ধরনের কাপড়, শয্যা সিট, বালিশের কভার, প্লাস্টিক ফাইবার ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
প্রধান বৈশিষ্ট্য	নমনীয়তা ও ব্যবহারে আরামদায়ক।	হালকা, শক্ত, দীর্ঘস্থায়ী, মোচড়ানো বা দ্রুত কুণ্ডলিত অবস্থায় আসে।
উদাহরণ	তুলা, শিমূল তুলা, পাটের আঁশ (প্রাকৃতিক); রেয়ন (Rayon) (কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত)।	নাইলন, পলিয়েস্টার, অ্যাক্রাইলিক (সবই কৃত্রিম/সিনথেটিক)।

গ. **রাবার ও প্লাস্টিক কীভাবে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত করে?** ২.৫

উত্তর : প্লাস্টিক হলো সিনথেটিক বা কৃত্রিমভাবে তৈরি এক ধরনের পলিমার, যা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি (পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস) থেকে প্রাপ্ত ছোট অণু বা মনোমার-এর পলিমারকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। এটি তাপ প্রয়োগে নরম ও নমনীয় হয় এবং শীতল হলে কঠিন ও স্থিতিশীল আকার ধারণ করে।

অপরদিকে, রাবার হলো একটি স্থিতিস্থাপক পলিমার। এটি প্রধানত প্রাকৃতিক উৎস (রাবার গাছ) থেকে প্রাপ্ত ল্যাটেক্স বা কৃত্রিমভাবে পেট্রোকেমিক্যালস থেকে তৈরি হতে পারে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো টেনে লম্বা করার পর এটি আবার তার পূর্বের আকারে ফিরে আসতে পারে।

রাবার ও প্লাস্টিক মূলত তাদের অ-বিয়োজনযোগ্যতা (Non-biodegradability) এবং ব্যাপক ব্যবহারের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত করে। এই দুটি উপাদানের পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

প্লাস্টিকের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার প্রধান কারণগুলি হলো:

দীর্ঘস্থায়ী দূষণ : প্লাস্টিক হলো পলিমার, যা প্রকৃতিতে সহজে বিয়োজিত (Decompose) হয় না। একটি প্লাস্টিক ব্যাগ বা বোতল সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে কয়েকশ থেকে হাজার বছর সময় নিতে পারে। ফলে, এটি বিশাল পরিমাণে স্থল দূষণ সৃষ্টি করে।

জলজ দূষণ ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি : প্লাস্টিক আবর্জনা নদী, সমুদ্র ও মহাসাগরে জমা হয়ে সামুদ্রিক জীবনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সামুদ্রিক প্রাণী, যেমন কচ্ছপ বা মাছ, প্লাস্টিককে খাদ্য ভেবে ভুল করে খেয়ে ফেলে, যা তাদের শ্বাসরোধ বা হজমতন্ত্রের অবরোধ ঘটিয়ে মৃত্যু ঘটায়। বড় প্লাস্টিক কণা ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়, যা খাদ্য শৃঙ্খলে (Food Chain) প্রবেশ করে এবং মানব স্বাস্থ্যকেও ঝুঁকিতে ফেলে।

বিষাক্ত রাসায়নিক নিঃসরণ : প্লাস্টিক তৈরির সময় ব্যবহৃত বা প্রক্রিয়াজাতকরণে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ এবং রঙের কারণে মাটিতে এবং জলে বিষাক্ততা ছড়ায়। এছাড়া, প্লাস্টিক পোড়ানো হলে ডাইঅক্সিন, ফিউরান ইত্যাদি ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয় যা বায়ু দূষণ ঘটায়।

যদিও রাবারকে কখনও কখনও প্লাস্টিকের চেয়ে কিছুটা ভালো মনে করা হয়, তবে এর পরিবেশগত প্রভাবও নেতিবাচক:

অ-বিয়োজনযোগ্যতা : বিশেষ করে কৃত্রিম রাবার (Synthetic Rubber) এবং গাড়ির টায়ারে ব্যবহৃত রাবার পলিমারাইজড হওয়ার কারণে প্রকৃতিতে সহজে বিয়োজিত হয় না। ফেলে দেওয়া টায়ার বিশাল পরিমাণে বর্জ্য সৃষ্টি করে এবং পরিবেশে বহু বছর ধরে বিদ্যমান থাকে।

রাসায়নিক নিস্কাশন : টায়ার বা রাবার পণ্য যখন দীর্ঘকাল ধরে খোলা জায়গায় পড়ে থাকে, তখন বৃষ্টির জল বা তাপের প্রভাবে এর মধ্যে থাকা ভারী ধাতু (Heavy Metals) এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে ও ভূগর্ভস্থ জলে মিশে গিয়ে দূষণ ঘটায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা : পুরোনো টায়ার বা রাবার পোড়ানো হলে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত যৌগ নির্গত হয়, যা বায়ু দূষণ ও গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন বৃদ্ধি করে।

ভূমির অপব্যবহার : অব্যবহৃত টায়ারগুলি জমা হয়ে মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের প্রজনন স্থানে পরিণত হতে পারে, যা রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ায়।